Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিকবার্তা

বণিক বার্তা, ০৯-১০-২০২৩, পৃষ্ঠা-০৪, ১ম অংশ

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংকের মালিক—এ গলদ শোধরাতে হবে

ড. এ কে এনামুল হক

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিন ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। এছাড়া তিনি এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তৈরি পোশাক শিল্প, বিশ্ববাজার, রফতানি খাত, দক্ষ জনশক্তি, রেমিট্যান্স, জলাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি খাতে প্রভাব, ঋণখেলাপিদের দৌরাত্ম্য, মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ পরিস্থিতি, ব্যাংক খাত, ডলারের বিনিময় হার, অর্থ পাচার ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম

আমাদের রিজার্ভ কমতির দিকে, এটা নিয়ে কি উদ্বেগের কারণ আছে?

প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত কেন কমছে? আমরা কেন এটা কীভাবে খরচ করছি? একদিকে এটা আমরা আমদানির জন্য খরচ করি। আমদানি যদি না বাড়ে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমরা কি ঋণের কিস্তি পরিশোধে ডলার ব্যয় করছি? কিন্তু উপাত্তে দুটোর কোনোটিরই সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে না। আমার রেমিট্যান্স বাড়ছে, আমার রফতানি বাড়ছে। তাহলে সবই তো ইতিবাচক। তাহলে ডলার রিজার্ভ কমছে কেন, এর মূল কারণ কি বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে কম রাখা? এটা যারা বিদেশে টাকা পাচার করতে চান তাদের জন্য ভালো। এর সুবিধাভোগীদের মধ্যে রয়েছে আমাদের মতো লোক যারা বিদেশে ভ্রমণ করে। অথবা যারা হুন্ডির ব্যবসা করবে তাদের জন্য ভালো। আমার মতে, ডলার মার্কেটকে স্ট্যাবিলাইজড করতে গিয়ে আমরা এ কাজটা করছি। এতে কী হচ্ছে? আইসক্রিমটা সস্তা হচ্ছে। অথচ আইসক্রিমটা সস্তা না করলেও চলত। সুতরাং, এটা আর কোন কারণে হচ্ছে তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই আমি বলব, এটা নিয়ে উদ্বেগের কারণ আগে বোঝা উচিত। তারপর সমাধান আসবে। যেভাবে দেখছি সেটা আমার কাছে এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এটা কেন হচ্ছে? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত এটা স্পষ্ট করা যে কেন আমার রিজার্ভ থেকে ডলার প্রতি মাসে কমছে? আমরা কি আমদানি বাড়িয়েছি? এটা তো ডাটায় দেখা যাচ্ছে না। ডলার কোথায় যাচ্ছে? এটা পরিষ্কার করা দরকার।

এর পেছনে অর্থ পাচারের কোনো ভূমিকা কি আছে?

হতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদি খোলা বাজারে ডলারের রেট বেশি থাকে, তাহলে হুন্ডিতে আসবে। হুন্ডিকে আমরা বলি পাচার। এটা আসলে বলা কঠিন। কারণ এতে তো দেশ থেকে টাকা যায় না। ওখানেই টাকা থাকছে আমাদের এখানে অন্য খাত থেকে টাকাটা যাচ্ছে। এটাকে পাচারের সংজ্ঞায় খুঁজে পাবেন না। তার মানে আমার দেশে আসা টাকার পরিমাণ কমে গেল। এটা একটা হতে পারে। আর দেশ থেকে টাকা যাওয়া এটা যে হচ্ছে তা তো নানা পরিসংখ্যানে আছে। আমি মনে করি, ডলার রেটে আমাদের যে চাপটা আছে সেটা সঠিক চাপ নয়। এতে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। মধ্য থেকে একটা গোষ্ঠী তো আমাদের দেশ থেকে সব সময়ই চলে যাওয়ার চেষ্টায় আছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ সবারই এক পা দেশের বাইরে। মূল প্রশ্ন হলো, আমরা কি আসলেই দেশে থাকতে চাইছি? নাকি দেশ থেকে চলে যাচ্ছি, এই যে চিন্তা এটাই সমস্যা। যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ প্রবণতা থাকবে তত দিন টাকা পাচার হবেই। কারণ আমি যখন আমার ছেলেকে বাইরে পড়াই তখন টাকা তো পাচার করিই। কীভাবে করি সেটা পরের কথা, কিন্তু যাচ্ছে। মানুষ ঢাকা থেকে সম্পত্তি বিক্রি করে চলে যাচ্ছে। ইমিগ্রেশন নিয়ে টাকা যাচ্ছে। টাকা পাচার হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সচিব, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক সবার মধ্যেই দেশ ছাড়ার প্রবণতা। সবাইকে কীভাবে দেশে রাখা যায় সে কৌশল নিয়ে এগোনো উচিত।

ব্যাংক খাতের বড় মাথাব্যথা হলো ঋণখেলাপি, এরই মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েকবার পুনঃতফসিল ঘোষণা করেছে। এ পদক্ষেপ তো সাফল্য পায়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে খুব বেশি উপায়ও ছিল না। খেয়াল করেন, যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে সেই ব্যাংকের মালিক। আমাদের দেশের সমস্যা হচ্ছে, অর্থনীতির ইনসেনটিভ ম্যাকানিজম সঠিক নয়। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি করার কথা। কিন্তু এখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংক বানানো হচ্ছে। এ স্ট্রাকচার (কাঠামো) যদি চলতে থাকে তাহলে ব্যাংকের এমন হালই হবে। আমরা আপাতত কী করছি—দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করছি। তা না হলে একটা ব্যাংক বিপর্যয়ে পড়বে। ব্যাংক বিপর্যয়ে পড়লে কী হবে, যার সঞ্চয় আছে তার সঞ্চয়টা লাপাত্তা হবে। সরকার যেটা করছে সেটা হচ্ছে আমানতকারীদের সঞ্চয় কিছুদিনের জন্য আপাতত সুরক্ষা দেয়া। কিন্তু মূল চিন্তা করা উচিত, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাদের ব্যবসা করার কথা, তারা ব্যবসা না করে ব্যাংক কিনে ফেলে। এটা আমাদের অর্থনীতির গলদ দিক। এ গলদ যত দিন শোধরাতে না পারব এ সংকটের সুরাহা হবে না।

অনেকে বলেন ডলারকে বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আপনি কী মনে করেন?

আমি এর সঙ্গে দ্বিমত করি না। এর কারণে যেটা হবে ডলারের মূল্য বাড়বে। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন খাবারের পণ্যের মূল্য বাড়বে। উত্তর হচ্ছে— আপনি তাদের আলাদাভাবে ভর্তুকি দেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আইসক্রিমকে ভর্তুকি দেয়া কেন? ভর্তুকি যার অতিপ্রয়োজন তাকে দেয়ার পক্ষেই আমি। এখন যেটা হচ্ছে তাতে টাকা পাচারকারীকেও ভর্তুকি দিচ্ছি। আমি কী করছি, আমি আমার দেশ থেকে টাকা পাঠানো সহজ করে দিচ্ছি। আমি এটার পক্ষে নই।

আপনি বলছিলেন ভর্তুকির কথা। মূল্যস্ফীতির কারণে তো সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই কাহিল। টিসিবির মাধ্যমে যা খাদ্যপণ্য দেয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত না। নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তকে টিসিবির আওতায় আনা উচিত বলে মনে করেন? বর্তমান মূল্যস্ফীতির ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সরকার কী পদক্ষেপ নিতে পারত যা নেয়নি?

এ মুহূর্তে বলা কঠিন। আমাদের মূল্যস্ফীতি এখনো ৮-৯ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। তুরস্কে এখন ৬৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি। তার মানে পৃথিবীর বহু দেশে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। সুতরাং, এটার কিছু ছিটেফোঁটা আমাদের গায়ে পড়বে না তা বলা যায় না। এজন্যই বললাম কোন কোন পণ্যে ভর্তুকি দেয়া হবে তা আগে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। টাকা পাচারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়া যাবে না। সিলেকটিভ সাবসিডি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে কৌশল উপযুক্ত তা নেয়া প্রয়োজন। তারপর মূল্যস্ফীতি রক্ষার জন্য ডলারের মূল্য সস্তা করতে হবে। কারণ পৃথিবীর বহু দেশে এখন মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। সরকার কিন্তু অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন পেট্রলের দাম কিন্তু সরকার বাড়ায়নি। সরকার অনেক ভার নিজের কাঁধে নিয়েছে। এটা এ সরকার কেন, যেকোনো সরকার করবে। মূল্যস্ফীতি সমস্যাটা বৈশ্বিক। আমাদের সম্মিলিতভাবেই এর সুরাহা খুঁজতে হবে। একটা কৌশল থাকা উচিত আমরা সমাধান কীভাবে করব। এবং সেটা দিয়ে যতটুকু পারা যায় সরকারের তা করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে আবার দেউলিয়া হওয়ার পথে কিন্তু এগোনো যাবে না। পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। শ্রীলংকা, গ্রিস, আর্জেন্টিনা দেউলিয়া হয়েছিল। খুব সাবধানে পদক্ষেপ নিতে হবে। পপুলার পদক্ষেপ না নিয়ে খুব চিন্তা করে এগোনো উচিত। বৈশ্বিকভাবে যেহেতু বাড়ছে আমাদেরও বাড়বে। মানুষের কষ্ট হবে এটাও সত্য। কিন্তু এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যাতে আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়।

Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা

বণিক বার্তা, ০৯-১০-২০২৩, পৃষ্ঠা-০৪, ২য় অংশ

নিরপেক্ষ নির্বাচন, মানবাধিকার ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর টানাপড়েন চলছে। আমাদের প্রধান রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্পে এর কী কী প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন?

আমার পর্যবেক্ষণে যা মনে হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো প্রভাব পড়তে পারে। পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, তৈরি পোশাকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানিকারক দেশ। এ রকম একটি উৎসকে অন্য কোনো উৎস দিয়ে রিপ্লেস করা সহজতর নয়। হঠাৎ করেই বিকল্প কোনো দেশ এত পণ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতি আমলে নিলে বাংলাদেশের সস্তা পণ্যের চাহিদা কিন্তু বাড়ছে। তবে ভূরাজনৈতিক কারণে হয়তো কোনো কোনো পণ্যে বাধা আসতে পারে, যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন না হয়।

আমরা এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার দিকে তাকাতে পারি। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি কিন্তু এখন অনেকটা স্থিতিশীল পর্যায়ে চলে এসেছে। কিছুদিন আগেও বেশ উত্তাল ছিল। মনে হচ্ছিল, একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে তারত মহাসাগরীয় দেশটির অর্থনীতি। বড় কোনো পরিবর্তন নয়, স্রেফ সরকারের শীর্ষ পদে রদবদলেই পরিস্থিতি স্ট্যাবিলাইজ হয়েছে। তার মানে বুঝতে হবে, এই যে ইস্যুগুলো তার অনেকটা রাজনৈতিক। এখানে যে হাইপ উঠেছে তা অনেকটা কৃত্রিমভাবে তৈরি ফেনোমেনা। যদি মানুষ এটা না বোঝে, তাহলে মানুষ এ হাইপে পা দেবে এবং অর্থনীতি আরো খারাপের দিকে যাবে। এটা শুধু রফতানির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সার্বিক অর্থনীতির জন্যই প্রযোজ্য। এখানেই সরকারের দায়িত্ব নাগরিকদের মনে আস্থা জাগানো। আমি যেটা মনে করি, এখানে কিছুটা চাপ অবশ্যই থাকবে, দৃশ্যমান কিছু প্রভাব হয়তো পড়বে। কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে বড় কোনো পরিবর্তন আশা করছি না। মাত্র দিনকয়েক আগে পত্রিকায় এসেছে, গার্মেন্টসের রফতানি বাড়ছে। অথচ এর সপ্তাহখানেক আগে মনে হচ্ছিল রফতানি কমছে। তার মানে এগুলো সব সময় ওঠানামা করে। কিন্তু সর্বোপরি গত ২০ বছরে গার্মেন্টস রফতানির গ্রোথ রেট (প্রবৃদ্ধি হার) নেতিবাচক হয়নি। সব সময় ইতিবাচক ছিল। অর্থাৎ পৃথিবীতে রিসেশন এসেছে, চলে গেছে; কিন্তু পোশাক খাতের রফতানিতে প্রভাব পড়েনি। অনেক সময় বলা হয়েছে রিসেশনের জন্য বাংলাদেশের রফতানি কমে যাবে। কিন্তু তা কমেনি। কারণ আমরা যে পণ্যগুলো বিক্রি করি তা সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য, বাজারে এগুলোর চাহিদা আছে।

আমরা তৈরি পোশাকের বাজার কীভাবে আরো বড় করতে পারি?

এভাবে চিন্তা করা উচিত, চীনের বাজার বাংলাদেশের বাজারের চেয়ে আরো দশ গুণ বড়। এখন চীন আগামী ১০ বা ১৫ বছর গার্মেন্টস আর রফতানি করবে না, বরং সে আমদানি করবে। কারণ তার উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া তাদের যে লেবার ফোর্স (শ্রমশক্তি) তারা গার্মেন্টসে কাজ করতে রাজি নন। তাই ভবিষ্যতে চীন আমাদের থেকে পণ্য নেবে। এ অবস্থায় আমাদের মার্কেট লিংকটা তৈরি করা উচিত। গার্মেন্টস রফতানিতে বাংলাদেশ বড় একটা শেইক আপ আসছিল ১৯৮২ সালে। তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতায়। যেটাকে আমরা এখন বলি বন্ডেড ওয়্যারহাউজ। এটা যদি না হতো তাহলে আজকের গার্মেন্টস এখানে আসতে পারত না। সুতরাং, এ রকম কৌশলগুলো মাথায় আনতে হবে। পৃথিবীতে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির রফতানি বাড়বে। মানুষ যতদিন থাকবে, জনসংখ্যা যত বাড়বে, গার্মেন্টসের চাহিদা তত বাড়বে। সরবরাহ কে করবে? চীন প্রথম, বাংলাদেশ দ্বিতীয়, ভিয়েতনাম দ্বিতীয় বা তৃতীয়। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? চীনের ভূমিকা এখন কমে যাচ্ছে, তাহলে কাউকে তো এগোতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুযোগ অনেক বেশি। আমাদের অবকাঠামো আছে, কর্মী আছে। এই যে স্ট্রাকচার আছে, আরেকটা দেশে স্ট্রাকচার তৈরি করতেও পাঁচ বছর সময় লাগবে। অতএব, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দুর্বল হবে এ রকম চিন্তার সঙ্গে আমি একমত নই।

চীনের বাজারে যে পরিবর্তন আসছে, বাংলাদেশ এ সুযোগ কীভাবে নিতে পারে?

নানাভাবে নেয়া উচিত। চীন যে শুধু গার্মেন্টস ছাড়বে তা নয়, সু ইন্ডাস্ট্রিও (জুতা) ছেড়ে দিচ্ছে। সু, গার্মেন্টস, টয়েজ (খেলনা) ইন্ডাস্ট্রি এগুলো সব লেবার ইনটেনসিভ পণ্য। লেবার ইনটেনসিভ যতগুলো পণ্য আছে চীন এক্ষেত্রে পৃথিবীর ফ্যাক্টরি। এ রকম একটা দেশ এগুলো ছেড়ে দেবে। কারণ তারা চলে গেছে নিজেদের ব্র্যান্ডে। প্রযুক্তিপণ্য, বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) উৎপাদন বাড়িয়েছে। বলা যায়, তাদের প্রযুক্তিগত উত্থান চলছে। এ উত্থান পর্বে তারা শ্রমঘন খাতগুলো থেকে সরে আসবে। সুতরাং তাদের সঙ্গে আমাদের কৌশল হওয়া উচিত—তুমি আমাদের বিনিয়োগ দাও, বাজারটা আমাকে দিয়ে দাও। এভাবে কৌশলপত্র সাজানো উচিত। এখন চীন যেটা করছে, সরকারি উদ্যোগে আমাদের অবকাঠামো ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু চীনের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আনা উচিত। চীন আমাদের দেশে অনেকটা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ কোরীয়দের বিনিয়োগ রয়েছে। কোরিয়া যখন মাল্টি ফাইবার কোটায় আটকে গেল, তখন কোরিয়া বলল আরেকটা দেশ থেকে বিক্রি করা উচিত।

তারা বাংলাদেশে মার্কেটটা নিয়ে এল। তারা কিন্তু বিনিয়োগ করেনি, তারা মার্কেটিং চ্যানেলটা তৈরি করে দিয়েছে। চীন হলো পৃথিবীর ফ্যাক্টরি, তাদের মার্কেটিং চ্যানেল প্রচুর। এ রকম একটা দেশের লেবার ইনটেনসিভ পণ্যগুলো আমরা সহজে আনতে পারি, সেই সুযোগটা তৈরি করে নেয়া উচিত। তবে এটা করতে গেলে চীনের সঙ্গে সেই সম্পর্কটা রাখার বিষয়টি সরকারকে মাথায় রাখতে হবে। চীনও উৎসাহী, সুতরাং, তাদের জন্য আলাদাভাবে ইকোনমিক জোন তৈরি করা উচিত, যাতে তারা আসতে পারে। ইউরোপ বা অন্যদের বাদ না দিয়েও আনা যাবে। আমরা যেমন জাপানিদের জন্য জোন করি। চাইনিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও জোন করি। কিন্তু সবাই যেন আসতে পারে। এরই মধ্যে উত্তরা শিল্পাঞ্চল, সেখানে এখন চীনের খেলনা কারখানা চলে এসেছে। এ রকম শত শত টয় ফ্যাক্টরি চলে আসবে। আমার মনে হয় সেটা চিন্তা করা উচিত। যখনই বিদেশী বিনিয়োগ আসবে, আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউম বেড়ে যাবে। সুতরাং আমাদের বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ সংকটটা থাকবে না, আমাদের এসব ব্যাপারে কৌশলগুলো চিন্তা করা উচিত।

আমাদের বড় বড় কারখানা তৈরি করতে হবে এবং দক্ষ জনশক্তিও লাগবে। আমরা কীভাবে তা তৈরি করব?

দুই রকম। একটা হচ্ছে দক্ষ ওয়ার্ক ফোর্স, আরেকটা হচ্ছে অদক্ষ ওয়ার্ক ফোর্সেরও চাহিদা আছে। সু ইন্ডাস্ট্রি, টয় ইন্ডাস্ট্রি অদক্ষ শ্রমিক দিয়েও চলবে। আর দক্ষতা বৃদ্ধিতে কৌশলী হতে হবে, অনেকটা সিঙ্গাপুরের মতো। সে জানে আমি যদি এখানে দক্ষ লোক আনি, এমনকি অন্য দেশ থেকেও আনি, যেমন ভারত। এক্ষেত্রে আমি যদি তাদের তৈরি সেবা বা পণ্য রফতানি করি তাহলে তিন গুণ পাব। সিঙ্গাপুর দক্ষ লোকের জন্য অনেক অ্যাডভান্টেজ তৈরি করছে। তারা অন্য দেশ থেকে লোক আনছে, কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যখন তারা পণ্য বা সেবা রফতানি করছে, তখন ডলার পাচ্ছে বা ডলারে আয় বেড়ে যাচ্ছে।

সুতরাং দুটি দুই উদাহরণ। দক্ষ লোক আনার ক্ষেত্রে আবুধাবি,

Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক-বার্তা

বণিক বার্তা, ০৯-১০-২০২৩, পৃষ্ঠা-০৪, ৩য় অংশ

অরব-আমিরাত বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এটা আমি প্রায়ই বলি এবং এখনো বলব, দক্ষ লোক অনতে হবে। আমরা কম্পিউটার জেন করছি, আসলে সেটা অবকাঠামো নয়, কম্পিউটার বা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির মূল অবকাঠামো হচ্ছে মানুষ। আমাদের যদি না থাকে তাহলে তা অন্য দেশ থেকে আসবে। অন্য দেশ থেকে এসে আমাদের এখানে কাজ করলে ক্ষতিটা কোথায়? আমাদের দেশে যদি না থাকে অন্য দেশ থেকে আসে তাহলে আমাদের কী ক্ষতি? আমরা যদি আমাদেরটা অনতে চাই তাহলে বেষ্ট উদাহরণ হচ্ছে টিএসএমসির মার্কিন বিনিয়োগ। তারা যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর খাতে ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ শ্রমশক্তি না থাকার কারণে তাদের পিছু হটতে হয়েছে। তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে দক্ষতা যেখানে দরকার সেখানে অদক্ষ লোক দিয়ে হবে না। যদি মনে হয় এ ইন্ডাস্ট্রিতে যাব তাহলে দক্ষ জনশক্তি অনার জন্য যে প্রণোদনা দরকার সেটা দেয়া প্রয়োজন। যাতে করে দক্ষ জনশক্তি এ ইন্ডাস্ট্রিতে আসে। এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এ দক্ষতা মোটাদাগে দেশের মঙ্গল বয়ে অনবে। তবে আমাদের ইমিগ্রেশন নীতিতে এই পলিসিগুলো নেই। আমরা সব সময় মনে করছি, আমাদের জনশক্তি তৈরি হয়ে প্রবাসে যাবে। আপনার মনে থাকার কথা, প্রথম ফ্লাইওভার তৈরির সময় চীনা জনশক্তি অনতে হয়েছিল, তবে এখন ফ্লাইওভার তৈরি করতে চীনা জনশক্তি লাগে না। এছাড়া প্রথম হাইওয়ে তৈরি করতে কোরিয়ার জনশক্তির প্রয়োজন হয়েছিল, তবে এখন দরকার নেই। অর্থাৎ দেশের বাইরে থেকে দক্ষ জনশক্তি এলে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। তারা এলে আমাদের মার্কেট চ্যানেল তৈরি করে দেবে। তাদের মাধ্যমে আমাদের বাজারে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে এবং এভাবে যদি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যায় তাহলে পুরো বাজারটা আমাদের হাতে চলে আসবে। সুতরাং আমাদের কর্মকৌশলগুলো এভাবেই গঠিত হওয়া দরকার।

আমাদের অর্থনীতির আরেকটি দিক হচ্ছে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। আগস্টে রেমিট্যান্স ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্নে চলে এসেছে। এর কারণ কী বলে মনে করেন?

ব্যক্তিগতভাবে এতে আমি উদ্বেগের কোনো কারণ দেখছি না। কারণ সব সময়ই রেমিট্যান্সের হার বৃদ্ধি এবং হ্রাসের মধ্য দিয়েই যায়। তবে রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার কারণ আমি অনুমান করে বলতে পারছি না। হতে পারে আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচন কেন্দ্র করে তারা টাকা-পয়সা কম পাঠাচ্ছে। কারণ তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন নির্বাচনে দাঁড়াবে হয়তোবা তখন তারা বেশি করে টাকা-পয়সা পাঠাবে। নির্বাচনের কারণে এটা কমাটা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ নির্বাচনের ফলাফল না জেনে কেউ তো আর বিনিয়োগ করবে না। আমার ধারণা, নির্বাচনের আগে আগামী তিন-চার মাস বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। এছাড়া এ সময় আমদানিও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এ সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিনিয়োগ অনেকেই করতে চাইবে না, তারা পরবর্তী সরকারের জন্য অপেক্ষা করবে। সুতরাং এ সময়ে রেমিট্যান্স কমে যাওয়া ভয়ের কোনো কারণ বলে আমার মনে হয় না। এক্ষেত্রে চিন্তা থাকবে পরিস্থিতি যেন স্থিতিশীল থাকে, এটি যেন এমনভাবে রূপান্তর না হয় যাতে ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারীরা ভয় পায়। এক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে তা হলো ট্রেন্ড (বাজার প্রবণতা কেমন)। সেখানে ওঠানামা করতেই পারে। আমাদের দেখতে হবে ট্রেন্ডটা এখনো ইতিবাচক, এর মধ্যে ওপরে উঠবে, নামবে। তাই আমি অতটা উদ্বেগের কারণ দেখছি না।

দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে বিদেশে পাঠালে রেমিট্যান্স প্রেরণ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রবাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লো-এন্ড শ্রমিক পাঠানো হচ্ছে। দক্ষ জনশক্তি কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে?

হ্যাঁ, এটা আমাদের একটি চিন্তার বিষয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে শ্রমিক চাহিদা আছে সেটা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেই বেশি বলে আমি মনে করি। তবে একসময় অবকাঠামো নির্মাণে কায়িক শ্রমিকদের চাহিদা কমে আসবে। এই সৌদি আরবও কিন্তু একসময় কায়িক শ্রমনির্ভর লোক নেবে না। তারা এখন মেশিনারির ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। তারা এমন লোক খুঁজবে যারা এ ধরনের যন্ত্রপাতি চালাতে সক্ষম। আমাদের গার্মেন্ট শিল্পেও এমনটা হচ্ছে। সেখানে লো-এন্ডের কর্মী নেয়া কমেছে, মেশিন নির্ভরতা বাড়ছে। তাহলে ভবিষ্যতে যারা সেসব মেশিন চালাতে সক্ষম হবে তাদের চাহিদা থাকবে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যারা হাই-এন্ডের তারা কিন্তু বিদেশে গেলে আর ফিরছে না। তাদের বেশির ভাগের মাধ্যমেই দেশে তেমন কোনো রেমিট্যান্স আসে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করা উচিত কীভাবে হাই-এন্ডের লোকদের দেশে রাখা যায়। বিশ্বায়নের এ যুগে ঘরে বসেই যেন তারা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। আমরা যেভাবে চিন্তা করছি অর্থনীতির দিক থেকে তা ভুল চিন্তা। কারণ একজন হাই-এন্ডের জনশক্তি বিদেশে চলে গেলে সে আর ফেরে না। বেশির ভাগ অর্থই বিদেশে ব্যয় করে; অল্প-ছিটেফোঁটা হয়তো মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য পাঠায়। তারা অনেকেই বিদেশে নাগরিকত্ব নিয়ে ফেলে। পলিসিগত দিক থেকে যা করা উচিত; তা হলো তাদের দেশে রাখা। বিদেশে গিয়ে কাজ করার চেয়ে দেশে বসে কাজ করা লাভজনক। ওখানে গিয়ে কাজ করলে হয়তো ২০ শতাংশ টাকা দেশে পাঠানো হয়। আর এখানে বসে কাজ করলে শতভাগ টাকাই আমাদের দেশে আসবে। সুতরাং দেশে যেন আমাদের দক্ষ শ্রমিকরা কাজ করতে পারেন সেই পথ সুগম করা উচিত। ফাইভজি আসছে, আমাদের দেশের চিকিৎসক, ফুপতি, আইনজীবীরা এখানে বসে বিদেশে সার্ভিস দিতে পারবেন। আপনি ভারতের দিকে দেখেন, তারা দেশে বসে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত টিউশনের মতো কাজ করছে, অংক পড়াচ্ছেন। বৈশ্বিক বাজার বিস্তৃত হচ্ছে, এখানে বসেই যেন রেমিট্যান্স আয় করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা গোষ্ঠী তো বিদেশে যাবেই, তাদের ঠেকানো যাবে না। তবে যারা দেশে রয়ে যাচ্ছে তারা যেন দেশে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসতে পারে সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের ফ্রিল্যান্সারদের দিকে নজর দিতে হবে। তাদের উৎসাহ দিতে হবে। তাদের আয়ে করারোপ করা সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করি না। এমনটা করলে দেশে বসে যারা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে তারা বিদেশে চলে যাবে।

সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট তিনটা শহর জলাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জলাবদ্ধতার সম্পর্ক আছে কিনা?

অবকাঠামোগত উন্নয়নই জলাবদ্ধতার একমাত্র কারণ না। আমরা একটি গবেষণায় দেখেছি যে সাধারণ মানুষের আচরণও জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ। তারা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলছে যেগুলো ড্রেনে গিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। যদিও চট্টগ্রামের কথা ভিন্ন, সেখানে নদীতে পানির উচ্চতা বেড়ে জোয়ারের সময় ড্রেনের পানিতে শহর তলিয়ে যায়। আমরা ড্রেন যতই বড় করি আর সেখানে যদি ময়লা ফেলি তাহলে জলাবদ্ধতা কখনই কমবে না। সিলেটে গবেষণা করে যেটা পেয়েছি ড্রেনে ময়লা ফেলার কারণে প্রতি বছর ড্রেনের তলানি দু-তিন ইঞ্চি উপরে উঠে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

চট্টগ্রাম ও সিলেটে জলাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে এগুলো পাহাড়ি এলাকা, এছাড়া নদী ভরাট, খাল দখল ইত্যাদি কারণ তো আছেই। এসব অঞ্চলে ড্রেনে শুধু ময়লা আসে না বালিও আসে, যার ফলে ড্রেনের জায়গা সংকুচিত হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ বিষয়গুলো খেয়াল করলে আমার মনে হয় জলাবদ্ধতা সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখবে। এক প্রকৌশলী আমাকে বলছিলেন, 'দেখুন চাইলে তো পুরো শহরই খাল করে ফেলা যায় কিন্তু এতে কি এ সমস্যার সমাধান হবে?' তাই আমি মনে করি মানুষের আচরণগত দিক বিবেচনায় নিয়ে এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ?

হ্যাঁ, আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ। এর কোনো স্ট্রাকচার (কাঠামো) নেই। এর সহজ উদাহরণ হলো—ঢাকা শহরে যে পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, সে পরিমাণ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি নেই। গাড়ি যদি না যায় তাহলে বর্জ্যগুলো কোথায় যায়? ড্রেনে। সমস্যাগুলো কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। কৃষিতে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে?

আমরা এর প্রভাব পাব। কারণ একদিকে বৃষ্টিপাতের ধারা বদলাচ্ছে, অন্যদিকে গরম বাড়ছে। এটা বৈশ্বিক, শুধু বাংলাদেশে তা নয়, বৈশ্বিকভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং আমরা একা পারব না। একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন—গরম বেড়ে গেলে ফার্মের মুরগির সংখ্যা কমে যাবে। কারণ সেখানে মড়ক লাগবে। এগুলোর জন্য যেটা আমাদের করতে হবে তা হলো নলেজ ফাইটিং (জ্ঞানভিত্তিক লড়াই)। গবেষণা করে বের করতে হবে কী পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে? কৃষি গবেষণায় বেশকিছু চমৎকার পরিবর্তন এসেছে। এখন যেমন বলা হচ্ছে সামার অনিয়নের (গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ) কথা। গ্রীষ্মে যে পেঁয়াজ উৎপন্ন করা যায় এটা গবেষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন। উৎপাদন হয়তো এখনো শুরু হয়নি কিন্তু গবেষকরা অনেক দূর এগিয়েছেন। গবেষকরা কাজ করছেন, এর সঙ্গে প্রযুক্তিও সংযুক্ত করতে হবে। যেমন সিলেটে আমাদের উদ্ভাবিত কমলা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের আমদানীকৃত কমলার চেয়ে অর্ধেক দামে বিক্রি হয় এবং খেতেও খুব সুস্বাদু। সমস্যাটা কী হচ্ছে—কমলাটি ফার্ম থেকে যখন বাজারে যাচ্ছে প্রক্রিয়াজাতের প্রযুক্তিটা উন্নত করেনি। ফলে এটা ১৫ দিনের মধ্যেই পচে যায়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা কমলা দুই মাসেও পচে না। কারণটা কী? এটাকে ওয়াক্স কোটিং (মোমের প্রলেপ) দেয়। আমাদের এটা নেই। তার মানে এখানে ইন্টারভেনশনটা হবে প্রযুক্তিগত, সেগুলো চিন্তা করতে হবে এবং ধীরে ধীরে আসবে।